Bangla 2nd Paper

YEAR 2019

10 MINUTE SCHOOL

DHAKA BOARD

অনুচ্ছেদ

বাংলা নববর্ষ

[ঢা. বো. ১৯, ১৭, ১৫; রা. বো. ১৫; চ. বো. ১৭, ১৫; য. বো. ১৭, ১৫; বরিশাল জিলা স্কুল; আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল]

,পয়লা বৈশাখ

[গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, রাজশাহী]

পয়লা বৈশাখ হলো বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। বাংলাদেশে এই উৎসব খ্রিষ্টীয় এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখে পালিত হয়। এটি বাংলাদেশের একটি জাতীয় উৎসব। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সকল বাঙ্গালি এই উৎসব পালন করে থাকে। সে হিসেবে এটি বাঙ্গালির একটি সার্বজনীন লোক উৎসব। একটি অসাম্প্রদায়িক ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশ গঠনে পয়লা বৈশাখের ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, সম্রাট আকবরের সময় (১৫৫৬ খ্রি.) থেকে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়। সম্রাট আকবরের নির্দেশে জ্যোতির্বিদ ফতেহ্‌উল্লাহ সিরাজি বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পুন্যাহের আয়োজন শুরু করেন। নববর্ষে সারা দেশের সাধারণ মানুষ হালখাতা, বৈশাখী মেলা এবং বিভিন্ন লোকজ মেলার আয়োজন করে। সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠান আয়োজন করে আসছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকেও নববর্ষ উপলক্ষ্যে মঙ্গল-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। নববর্ষের দিনে ছেলেরা পাজামা-পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়ায়। চারদিকে এক বর্ণিল পরিবেশ তৈরি হয়।

পরিবেশ দূষণ

[ঢা. বো. ১৯; ১৭, ১৫; ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা খাগড়াছড়ি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ; বগুড়া জিলা স্কুল]

আদিমকালে মানুষ একান্তভাবেই পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতিকে নিজের বশে আনতে শুরু করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা আবিষ্কার মানুষকে দিয়েছে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু আবিষ্কৃত প্রযুক্তির অপব্যবহার দিন দিন পরিবেশকে দূষিত করে তুলেছে। পরিবেশ হলো আমাদের প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উপাদানের সমষ্টি। পানি, মাটি, বায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাকৃতিক বা মানব-সৃষ্ট কোন কারণে যদি পরিবেশের উপাদানগুলোর কাঙ্ক্ষিত মান বিনষ্ট হয় তাহলে পরিবেশ মানুষ বা প্রাণীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। পরিবেশের এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে। পরিবেশ দূষণের প্রাকৃতিক কারণগুলো হলো- ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি। আর কৃত্রিম বা মনুষ্য-সৃষ্ট কারণগুলো হলো- জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পকারখানায় বিষাক্ত কেমিক্যালের ব্যবহার, শিল্পকারখানা ও জানবাহনে জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার ইত্যাদি। এসব কারণে পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পানি, মাটি, বায়ু ইত্যাদি প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। এছাড়া কীটনাশক, গুঁড়ো সাবান, প্লাস্টিকের ব্যবহার ইত্যাদির ফলেও পরিবেশ দূষিত হয়। শিল্পকারখানা ও জানবাহন থেকে নির্গত সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ক্লোরো-ফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি বায়ুমণ্ডলকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে বিশ্বের সচেতন মানুষ আজ শঙ্কিত। কেননা পরিবেশ দূষণের কারণে মাবন সভ্যতার অস্তিত্বই আজ হুমকীর সম্মুখীন। তাই পরিবেশ রক্ষায় বিশ্বের সচেতন মানুষ জেগে উঠছে, গড়ে উঠছে অনেক পরিবেশবাদী সংগঠন। এসব সংগঠনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয় ঠিক করতে পরিবেশ বিষয়ক নানা সম্মেলনে একত্র হচ্ছে। বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশের সংবিধানেও পরিবেশ-সংক্রান্ত ধারা যুক্ত হয়েছে। তবে সরবস্তরের মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা ব্যতীত পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব নয়।

সারমর্ম

১। দৈন্য যদি আসে আসুক, লজ্জা কিবা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি না চাহে
ধৈর্য ধরে থাকিস।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস।
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে
ঊর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।

[ঢাকা বোর্ড '১৯]

সারমর্মঃ

জীবনে চলার পথে ঘাত প্রতিঘাত আসবেই। সেই সময়গুলোতে যদি কেউ সাহায্যের হাত না বাড়ায়, তাহলেও ভেঙে পড়া যাবে না। নিজের ওপর আস্থা রেখে সব প্রতিকূল পরিস্থিতি সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে হবে।

RAJSHAHI BOARD

অনুচ্ছেদ

শিশুশ্রম

[রা. বো. ১৯, ১৭; ব. বো. ১৯; জালালাবাদ ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; এস ও এস হারম্যান মেইনার স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

শিশুকাল অতিক্রমের আগে অর্থের বিনিময়ে বা বিনা বেতনে কেউ কায়িকশ্রমের কাজে নিয়োজিত হলে তাকে শিশুশ্রম বলে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এই ধরনের শ্রমকে শোষণ বলে বিবেচনা করে। বহু দেশে এটিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং আমাদের দেশেও শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করা হয়। শিশুশ্রমকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম দিবস পালিত হয়। মূলত অসচ্ছল ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা শিশুশ্রমের সাথে নিয়োজিত। অষ্টাদশ সতাব্দীর শেষ দিকে গ্রেট ব্রিটেনে সর্বপ্রথম শিশুশ্রম একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। ২০০৬ সালে শিশু সনদে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবুও থেমে নেই শিশুশ্রম। লেখাপড়ার খরচ দিতে না পারা, সংসারের অসচ্ছলতা পিতা-মাতাকে বাধ্য করে সন্তানকে শ্রমে নিযুক্ত করতে। শিশুশ্রম শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ করে। একটি দেশের গুনগত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয় তার মধ্যে শিশুশ্রম কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের মাঝে সুপ্ত থাকে অমিত সম্ভাবনা। আজকের শিশুই আগামী দিনের কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ বা শিক্ষাবিদ। ভবিষ্যতের কর্ণধার এই শিশুদের নির্ঝঞ্ঝাট ও মসৃণ পথচলা নিশ্চিত করতে পারলেই একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠনের পথ অনেকটা সুগম হয়। তাই রাষ্ট্র, সমাজ ও সুযোগ থাকলে ব্যক্তি উদ্যোগে শিশুশ্রম বন্ধে তৎপর হওয়া জরুরি। শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে ও তাদের বিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তবেই আজকের শিশু আগামী দিনের সম্পদে রূপান্তরিত হবে।

ভাবসম্প্রসারণ

মানুষ বাঁচে তাহার কর্মের মধ্যে বয়সের মধ্যে নহে।

[রা.বো.১৯ ; চ.বো.১৯ ; ঢা.বো.১৭]

কর্মই মানুষকে অমর করে রাখে, বয়স নয়। বয়সে যে যত প্রবীণ হোক না কেন, কর্ম যদি উল্লেখযোগ্য না থাকে তাহলে মানুষ তাকে স্মরণ করে না। আবার বয়সে ক্ষুদ্র হলেও কর্মের দ্বারা মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং শিক্ষক ডিরোজিও অত্যন্ত কমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও আপন কর্মের মহিমায় বেঁচে আছেন মানুষের মাঝে।

মানুষ মরণশীল। আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পাঠিয়েছেন এ পৃথিবীতে। কিন্তু একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের জীবনের পরিধি অপরিমেয় নয়। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে মানুষ পৃথিবী থেকে চলে যায়। স্রষ্টার ইচ্ছায় কোনো কোনো মানুষ বাঁচে দীর্ঘদিন, আবার অনেকে আয়ু পায় স্বল্পদিন। তারপর মানুষের জীবনের অবসান হয়। আত্মীয়স্বজনরা তাকে মনে রাখে কিছুদিন; এরপর ভুলে যায়। তারপর মানুষ চিরতরে হারিয়ে যায় স্মরণের ওপারে। যার জন্ম হয়েছে তাকে মরতে হবেই। মানুষের জীবনের পরিধিও খুব বেশি নয়, কয়েক বছর মাত্র। মানুষের জীবনকাল সম্পর্কে কেউই ওয়াকেবহাল নয়। কেউ বহু বছর বেঁচে থাকে আবার কেউ অভ্যঘকালের মধ্যে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়। কেউ আবার দুই-একদিনও বাঁচে না। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সবকিছুই শেষ হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কয়েকদিন শোক-তাপ পালনের মধ্যেই তাদের কর্তব্য সমাপন করে। অবশেষে দুনিয়ার মানুষ একদিন তাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। এই-ই হল মানুষের জীবন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, যে ব্যক্তি বেশি হায়াত বা দীর্ঘজীবন লাভ করে দুনিয়া হতে বিদায় নিল সে-ই দুনিয়াতে বেশি বেঁচে রইল। প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। মানুষকে আল্লাহতায়ালা অসংখ্য গুণরাজির সমাবেশে এ দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন। মানুষ তাদের কর্মের মাধ্যমে দুনিয়াকে একটি শান্তিময় স্থান হিসাবে পরিগণিত করতে পারে। মানুষ তাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে দুনিয়াতে এমন অক্ষয়-কীর্তি স্থাপন করতে পারে যা চিরকাল জগতের মানুষের উপকারে আসবে এবং মানুষ পরম শ্রদ্ধাভরে ঐ মানুষকে স্মরণ করবে। এভাবে মানুষ মহৎ কর্মের দ্বারা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। মহান কীর্তিমান পুরুষ দুনিয়াতে যতদিনই বেঁচে থাকুক না কেন, দুনিয়া ত্যাগের পরেও বেঁচে থাকেন। অর্থাৎ তাঁর কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি অমর হয়ে থাকেন। তাই মহাপুরুষগণ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই শুধু তাদের জীবন নয়—দুনিয়া লয়প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্তই তাঁদের জীবন।

মানবচরিত্রে আছে দুটি দিক ভালো ও মন্দ। যাদের ভালো কাজের পরিমাণ বেশি, তারা স্মরণীয় হয়ে থাকে। আর যারা আচরণে মন্দ বলে বিবেচিত, তারা জীবিতকালে নিন্দনীয় হন এবং মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই বিস্মৃত হয়ে যান। ভালো মানুষ সমাজ ও জাতির কল্যাণার্থে যে অবদান রাখেন, তা মানুষ সব সময় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখে।

মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করলে এ সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ তার কর্মের মধ্যেই বেঁচে থাকে—বয়সের মধ্যে নয়। দুনিয়ার বহুলোক শত শত বছর পরমায়ু ভোগ করে মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমরা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত জানি না। আবার বহুলোক অপেক্ষাকৃত কম পরমায়ু লাভ করেও ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু আজকের দুনিয়ার মানুষ ক্ষণে ক্ষণে তাঁদের নাম স্মরণ করে। তাঁরা পার্থিব জীবন ত্যাগ করেও আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহম্মদ (স), হযরত ঈসা (আ), হাজী মুহম্মদ মহসীন, নিউটন, আইনস্টাইন প্রমুখ ব্যক্তি বহু পূর্বে দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। অথচ তাঁদের কাজ-কর্ম এবং কীর্তিকলাপের জন্য তাঁরা অমর হয়ে থাকবেন। এ মরজগতের মানুষ কাজ-কর্মের মাধ্যমেই লাভ করেন অমরতা। তাই আমাদের উচিত এ নশ্বর পৃথিবীতে দীর্ঘজীবন লাভ করতে অর্থাৎ মরেও অমর হয়ে থাকার জন্য মহৎকর্ম সম্পাদন করা। কীর্তিমান পুরুষ পৃথিবীতে যত দিন বেঁচে থাকেন, তাঁর কর্মপ্রবণতা আবর্তিত হয় মানুষের উপকারার্থে। এঁরা অল্পায়ু হন অথবা দীর্ঘায়ু, । তাতে কিছু এসে যায় না। এমনকি এ ধরনের মানুষ কোনো শ্রেণি থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, সেটাও বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচনার কথা, জ্ঞান বিষয় একটাই, সেটা হলো মানুষের কল্যাণার্থে তাঁর কর্ম কী ছিল! এ পৃথিবীতে বহু মহান ব্যক্তি ও মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা তাঁদের স্বল্পায়ু জীবনেও কাজ করে গেছেন বিশাল মাপের।

মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে, তার বয়সের জন্য নয়। কত কোটি কোটি মানুষ এ পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর কেউ তাদেরকে মনে রাখে নি। তারা ভেসে গিয়েছে কালস্রোতে। অথচ যেসব কার্তিমান ব্যক্তিবর্গ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা অমর। নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ অবিনশ্বর হয় কর্মগুণে। মানবকল্যাণে ব্যয়িত জীবন মানুষের মনে বেঁচে থাকে অনন্ত কাল। বস্তুত জীবনের সার্থকতা এখানেই নিহিত।

সারাংশ

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালান-কোঠার সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড় হয় না, বড় হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনপন করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনও শক্ত আর দৃঢ়মূল হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনাশ্রয়ী হয়ে জাতির সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লেই তবে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা।

[রাজশাহী বোর্ড '১৯]

সারাংশঃ

একটি জাতির অবকাঠামোগত উন্নয়ন দিয়ে সেই জাতির প্রগতি নির্ধারণ করা যায় না। সেই জাতি কতটুকু মানবিক, তাদের মূল্যবোধ কতটা শক্তিশালী, তা দিয়েই সেই জাতির প্রকৃত যোগ্যতা নিরুপণ করতে হবে।

10 MINUTE SCHOOL

DOWNLOAD THE APP
10 MINUTE SCHOOL

সারমর্ম

৩। স্বাধীনতা স্পর্শমণি সবাই ভালবাসে,
সুখের আলো জ্বলে বুকে দুঃখের ছায়া নাশে।
স্বাধীনতা সোনার কাঠি খোদার সুধা দান,
স্পর্শে তাহার নেচে উঠে শূন্য দেহে প্রাণ।
মনুষ্যত্বের বান ডেকে যায় যাহার হৃদয়তলে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায় ভীরু স্বাধীনতার বলে।

[রাজশাহী বোর্ড '১৯]

সারমর্মঃ

স্বাধীনতা ঠিক স্পর্শমনির মতো। কারণ, স্পর্শমনির স্পর্শে যেমন লোহা সোনায় রূপান্তরিত হয়, ঠিক তেমনি একজন ভীরু মানুষও স্বাধীনতার স্পর্শ পেলে ভীষণ সাহসী হয়ে উঠতে পারে। এইজন্য স্বাধীনতাকে বলা হয় সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ দান।

আবেদনপত্র

প্রশ্ন: মনে করো, তুমি খুলনা জিলা স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। প্রশংসাপত্র চেয়ে তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ।

[রাজশাহী বোর্ড '১৯]

০৫/২/২০২২
প্রধান শিক্ষক,
খুলনা জিলা স্কুল,
খুলনা।

বিষয়ঃ প্রশংসাপত্র চেয়ে আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের একজন নিয়মিত ছাত্র। আমার বাবা একজন সরকারি চাকরিজীবী। সম্প্রতি তিনি রাজশাহীতে বদলি হয়েছেন। আগামী সপ্তাহে আমরা পুরো পরিবার সেখানে স্থানান্তরিত হব এবং আমার সেখানকার কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে। আমার নতুন বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এখান থেকে একটি প্রশংসাপত্র আবশ্যক।

অতএব, আমার আকুল আবেদন, বিষয়টি বিবেচনা করে আমাকে একটি প্রশংসাপত্র প্রদান করতে আপনার সদয় মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক,
আপনার অনুগত ছাত্র
ক
দশম শ্রেণি,
বিজ্ঞান বিভাগ
রোল নম্বর-১

COMILLA BOARD

অনুচ্ছেদ

গ্রন্থাগার

[কু. বো. ১৯]

গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি সমাজ উন্নয়নের বাহন। একটি জাতির মেধা, মনন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারণ ও লালনকারী হিসেবে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। তাই গ্রন্থাগারকে বলা হয় 'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়'। মানুষের বই পড়ার আগ্রহ থেকেই গ্রন্থাগারের উৎপত্তি। গ্রন্থাগারের ইতিহাস বেশ পুরোনো। প্রথম দিকে মানুষ নিজের ঘরের কোণে, মন্দির, মসজিদ, উপাসনালয়ে এবং রাজকীয় ভবনে গ্রন্থ সংরক্ষণ করতে শুরু করে। রোমে প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্যে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। রোম ছাড়াও প্রাচীনকালে ব্যাবিলন, মিশর, চীন, ভারত ও তিব্বতে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। সভ্যতার ইতিহাসে স্পেনে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য দেশটি বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছিল। দেহের পুষ্টি যোগায় খাদ্য, আর বই জোগায় মনের খাদ্য। তাই 'বই' সভ্য মানুষের নিত্যসঙ্গী। জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে গ্রন্থ। লেখক লেখেন, প্রকাশক ছাপেন, বিক্রেতা বই বিক্রি করেন আর গ্রন্থাগারিকরা সংগ্রহ করে যথাযথ বিন্যাস করেন এবং পাঠকসমাজ ঐসব উপাদান থেকে মনের খোরাক এবং জ্ঞানলাভে সমর্থ হন। কম লেখাপড়া জানা ও গরিব মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনি জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারের ভূমিকা অভাবনীয়। গ্রন্থাগারে থাকে বিচিত্র বিষয়ের গ্রন্থ। আগ্রহী পাঠকের জন্যে গ্রন্থাগার জ্ঞানার্জনের যে সুযোগ করে দেয়, সে সুযোগ অন্য কোথাও নেই।

সারমর্ম

সন্ধ্যা যদি নামে পথে, চন্দ্র পূর্বাচল কোণে
না হয় উদয়,
তারকার পুঞ্জ যদি নিভে যায়
প্রলয় জলদেনা করিব না ভয়।
হিংস্র ঊর্মি ফণা তুলি,
বিভীষিকা-মূর্তি ধরি যদি গ্রাসিবারে আসে,
সে মৃত্যু লঙ্ঘিয়া যাব সিন্ধুপারে
নবজীবনের নবীন আশ্বাসে।

[কুমিল্লা বোর্ড '১৯]

সারমর্মঃ

জীবনে যতই বাঁধা বিপত্তি আসুক না কেন, মনোবল অটুট রাখতে হবে। চলার পথে আসা যাবতীয় ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করা তখনই সম্ভব যখন নবজীবনের আশা মানুষের মনে স্থির থাকবে। কাজেই আপদকালীন সময়ে আশা ছেড়ে দেয়া চলবে না।

JESSORE BOARD

অনুচ্ছেদ

একুশে বইমেলা

বা অমর একুশে গ্রন্থমেলা

[দি. বো. ১৯, ১৭; সি. বো. ১৭; য. বো. ১৯; মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা; সিলেট ক্যাডেট কলেজ; নোয়াখালী জিলা স্কুল]

অমর একুশে গ্রন্থমেলা বর্তমানে বাঙালির প্রাণের মেলা। এই মেলার ইতিহাস বাংলাদেশের মতই প্রাচীন। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণের বটতলায় এক টুকরো চটের উপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি একাই বইমেলা চালিয়ে যান। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমী এ মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়। কালের পরিক্রমায় অমর একুশে গ্রন্থমেলা এখন অনেক বিস্তৃত ও পরিণত। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোর অন্যতম এই মেলা। বইপ্রেমী বাঙালির চাহিদা মেটাতে বাংলা একাডেমি ২০১৪ সালে মেলার পরিসর বাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করেছে। ক্রেতাদের আকর্ষণে প্রকাশকদের আয়োজনের কমতি থাকে না। নান্দনিক স্টল ও দৃষ্টিনন্দন বই পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করে তুলে নতুন বই হাতে তুলে নিতে। মাসব্যাপী আয়োজিত এ মেলায় ক্রেতাদের জন্য থাকে বিশেষ ছাড়। বিখ্যাত লোকদেরও দেখা মেলে মেলায় এলে। মেলা চলাকালীন প্রতিদিনই বিভিন্ন আলোচনাসভা, কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে লেখককুঞ্জ, যেখানে লেখকরা উপস্থিত থাকেন ও পাঠকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এটি বাংলা একাডেমির একটি মহৎ উদ্যোগ ও আয়োজন। এই মেলা নিত্যনতুন পাঠক তৈরিতেও যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছে। সারা বছর নানা বয়সি মানুষ এ মেলার প্রতীক্ষায় থাকে। লেখক-প্রকাশক-পাঠকের অসাধারণ এক সেতুবন্ধ রচিত হয় এ মেলায়। এখানে এলেই সাহিত্যের সকল রসদের সন্ধান পান সকল শ্রেণীপেশার মানুষ। অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমাদের জাতীয় চেতনার সাথেও সম্পৃক্ত।

সারাংশ

শ্রমকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করো। কালি-ধুলার মাঝে রৌদ্র-বৃষ্টিতে কাজের ডাকে নেমে যাও। বাবু হয়ে ছায়ায় পাখার তলে থাকবার দরকার নেই। এ হচ্ছে মৃত্যুর আয়োজন। কাজের ভিতর কুবুদ্ধি, কুমতলব মন-চিত্তে বাসা বাঁধতে পারে না। কাজে শরীরে সামর্থ্য জন্মে ; স্বাস্থ্য, শক্তি, আনন্দ, স্ফুর্তি সকলই লাভ হয়। পরিশ্রমের পর যে অবকাশ লাভ হয়, তা পরম আনন্দের অবকাশ। তখন কৃত্রিম আয়োজন করে আনন্দ করবার কোনো প্রয়োজন হয় না। শুধু চিন্তার দ্বারা জগতের হিত সাধন হয় না। মানবসমাজে মানুষের সঙ্গে কাজে, রাস্তায়, কারখানায় মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে মানুষ নিজেকে পূর্ণ করে। [যশোর বোর্ড '১৯]

সারাংশঃ

শ্রমকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ না করলে মানুষের জীবনে পূর্ণতা সম্ভব নয়। শ্রমহীন আলস্য মানুষের দেহ ও মন-দুইয়ের জন্যই ক্ষতিকর। আর শ্রমের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজের এবং সমাজের জন্য সহজেই কল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

জাতিকে শক্তিশালী, শ্রেষ্ঠ, ধন-সম্পদশালী, উন্নত ও সুখী করতে হলে শিক্ষা ও জ্ঞান বর্ষার বারিধারার মতো সর্বসাধারণের মধ্যে সমভাবে বিতরণ করতে হবে। দেশে সরল ও সহজ ভাষার নানা প্রকারের পুস্তক প্রচারের দ্বারা এ কার্য সিদ্ধ হয়। শক্তিশালী দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষদের লেখনীর প্রভাবে একটি জাতির মানসিক ও পার্থিব অবস্থার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে সংশোধিত হয়ে থাকে। দেশের প্রত্যেক মানুষ তার ভুল ও কুসংস্কার, অন্ধতা ও জড়তা, হীনতা ও সংকীর্ণতা পরিহার করে একটি বিনয় মহিমোজ্জ্বল উচ্চ জীবনের ধারণা করতে শেখে। মনুষ্যত্ব ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করাই সে ধর্ম মনে করে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয় এবং গভীর দৃষ্টি লাভ করে। তারপর বিরাট জাতির বিরাট বিরাট দেহে শক্তি জেগে ওঠে। [যশোর বোর্ড '১৯]

সারাংশঃ

জাতিকে সফল ও শক্তিশালী করতে গেলে সমাজের সর্বস্তরে সমানভাবে শিক্ষা বিস্তার করা আবশ্যক। একমাত্র সার্বজনীন শিক্ষার মধ্য দিয়েই জাতির সবাইকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা সম্ভব, আর এভাবেই জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো সম্ভব।

DOWNLOAD
THE APP

10 MINUTE SCHOOL

সারমর্ম

২। কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতেই সুরাসুর।
রিপুর তাড়নে যখনি মোদের বিবেক পায় গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়ে ঘরে।

[যশোর বোর্ড '১৯]

সারমর্মঃ

স্বর্গ কিংবা নরক শুধুমাত্র পরকালের বিষয়ই নয়। ইহকালেও মানুষের আচরণ ও কাজের মধ্যে দিয়ে স্বর্গ ও নরক রচিত হতে পারে। মানুষ যখন বিবেকহীন হয়ে কোনো অপকর্ম করে, তখন সে নিজের এবং চারপাশের অন্যদের জন্য নরক সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, স্নেহ ও প্রীতির মধ্য দিয়ে মানুষ চাইলেই পারে একটা কুঁড়েঘরকেও স্বর্গে পরিণত করতে।

আবেদনপত্র

প্রশ্নঃ মনে করো তুমি সুপ্তি সাহা। জয়নগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করে প্রধান শিক্ষকের নিকট একটি দরখাস্ত লেখ।

[যশোর বোর্ড '১৯]

০৫/২/২০২২

প্রধান শিক্ষক,

জয়নগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,

জয়নগর, গাজীপুর।

বিষয়ঃ শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। আমরা দীর্ঘদিন ধরে বইয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে পড়েছি। কিন্তু, শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে প্রকৃত জ্ঞানার্জন সম্ভব হয় না বলে আমরা একটি শিক্ষামূলক স্থানে সফরে যেতে চাই। আমাদের শ্রেণিশিক্ষকও এই ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন।

অতএব, আমাদের আকুল আবেদন, বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন।

বিনীত নিবেদক,

আপনার অনুগত ছাত্রী

সুপ্তি সাহা

দশম শ্রেণি,

মানবিক বিভাগ, রোল নম্বর-১

দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পক্ষে।

CHITTAGONG BOARD

ভাবসম্প্রসারণ

মানুষ বাঁচে তাহার কর্মের মধ্যে বয়সের মধ্যে নহে।

[রা.বো.১৯ ; চ.বো.১৯ ; ঢা.বো.১৭]

কর্মই মানুষকে অমর করে রাখে, বয়স নয়। বয়সে যে যত প্রবীণ হোক না কেন, কর্ম যদি উল্লেখযোগ্য না থাকে তাহলে মানুষ তাকে স্মরণ করে না। আবার বয়সে ক্ষুদ্র হলেও কর্মের দ্বারা মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং শিক্ষক ডিরোজিও অত্যন্ত কমবয়সী হওয়া সত্ত্বেও আপন কর্মের মহিমায় বেঁচে আছেন মানুষের মাঝে।

মানুষ মরণশীল। আল্লাহ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পাঠিয়েছেন এ পৃথিবীতে। কিন্তু একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, মানুষের জীবনের পরিধি অপরিমেয় নয়। একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে মানুষ পৃথিবী থেকে চলে যায়। স্রষ্টার ইচ্ছায় কোনো কোনো মানুষ বাঁচে দীর্ঘদিন, আবার অনেকে আয়ু পায় স্বল্পদিন। তারপর মানুষের জীবনের অবসান হয়। আত্মীয়স্বজনরা তাকে মনে রাখে কিছুদিন; এরপর ভুলে যায়। তারপর মানুষ চিরতরে হারিয়ে যায় স্মরণের ওপারে। যার জন্ম হয়েছে তাকে মরতে হবেই। মানুষের জীবনের পরিধিও খুব বেশি নয়, কয়েক বছর মাত্র। মানুষের জীবনকাল সম্পর্কে কেউই ওয়াকেবহাল নয়। কেউ বহু বছর বেঁচে থাকে আবার কেউ অভ্যঘকালের মধ্যে দুনিয়া ছেড়ে চলে যায়। কেউ আবার দুই-একদিনও বাঁচে না। মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের সবকিছুই শেষ হয়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কয়েকদিন শোক-তাপ পালনের মধ্যেই তাদের কর্তব্য সমাপন করে। অবশেষে দুনিয়ার মানুষ একদিন তাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। এই-ই হল মানুষের জীবন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, যে ব্যক্তি বেশি হায়াত বা দীর্ঘজীবন লাভ করে দুনিয়া হতে বিদায় নিল সে-ই দুনিয়াতে বেশি বেঁচে রইল। প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। মানুষকে আল্লাহতায়ালা অসংখ্য গুণরাজির সমাবেশে এ দুনিয়াতে পাঠিয়ে থাকেন। মানুষ তাদের কর্মের মাধ্যমে দুনিয়াকে একটি শান্তিময় স্থান হিসাবে পরিগণিত করতে পারে। মানুষ তাদের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে দুনিয়াতে এমন অক্ষয়-কীর্তি স্থাপন করতে পারে যা চিরকাল জগতের মানুষের উপকারে আসবে এবং মানুষ পরম শ্রদ্ধাভরে ঐ মানুষকে স্মরণ করবে। এভাবে মানুষ মহৎ কর্মের দ্বারা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। মহান কীর্তিমান পুরুষ দুনিয়াতে যতদিনই বেঁচে থাকুক না কেন, দুনিয়া ত্যাগের পরেও বেঁচে থাকেন।

অর্থাৎ তাঁর কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি অমর হয়ে থাকেন। তাই মহাপুরুষগণ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিনই শুধু তাদের জীবন নয়—দুনিয়া লয়প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্তই তাঁদের জীবন। মানবচরিত্রে আছে দুটি দিক ভালো ও মন্দ। যাদের ভালো কাজের পরিমাণ বেশি, তারা স্মরণীয় হয়ে থাকে। আর যারা আচরণে মন্দ বলে বিবেচিত, তারা জীবিতকালে নিন্দনীয় হন এবং মৃত্যুর পর স্বাভাবিকভাবেই বিস্তৃত হয়ে যান। ভালো মানুষ সমাজ ও জাতির কল্যাণার্থে যে অবদান রাখেন, তা মানুষ সব সময় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণে রাখে।

মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করলে এ সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ তার কর্মের মধ্যেই বেঁচে থাকে—বয়সের মধ্যে নয়। দুনিয়ার বহুলোক শত শত বছর পরমায়ু ভোগ করে মৃত্যুবরণ করেছে, অথচ আমরা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত জানি না। আবার বহুলোক অপেক্ষাকৃত কম পরমায়ু লাভ করেও ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন, কিন্তু আজকের দুনিয়ার মানুষ ক্ষণে ক্ষণে তাঁদের নাম স্মরণ করে। তাঁরা পার্থিব জীবন ত্যাগ করেও আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহম্মদ (স), হযরত ঈসা (আ), হাজী মুহম্মদ মহসীন, নিউটন, আইনস্টাইন প্রমুখ ব্যক্তি বহু পূর্বে দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। অথচ তাঁদের কাজ-কর্ম এবং কীর্তিকলাপের জন্য তাঁরা অমর হয়ে থাকবেন। এ মরজগতের মানুষ কাজ-কর্মের মাধ্যমেই লাভ করেন অমরতা। তাই আমাদের উচিত এ নশ্বর পৃথিবীতে দীর্ঘজীবন লাভ করতে অর্থাৎ মরেও অমর হয়ে থাকার জন্য মহৎকর্ম সম্পাদন করা। কীর্তিমান পুরুষ পৃথিবীতে যত দিন বেঁচে থাকেন, তাঁর কর্মপ্রবণতা আবর্তিত হয় মানুষের উপকারার্থে। এঁরা অল্পায়ু হন অথবা দীর্ঘায়ু, । তাতে কিছু এসে যায় না। এমনকি এ ধরনের মানুষ কোনো শ্রেণি থেকে আবির্ভূত হয়েছেন, সেটাও বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচনার কথা, জ্ঞান বিষয় একটাই, সেটা হলো মানুষের কল্যাণার্থে তাঁর কর্ম কী ছিল! এ পৃথিবীতে বহু মহান ব্যক্তি ও মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা তাঁদের স্বল্পায়ু জীবনেও কাজ করে গেছেন বিশাল মাপের।

মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মাধ্যমে, তার বয়সের জন্য নয়। কত কোটি কোটি মানুষ এ পৃথিবীতে এসেছে। কিন্তু তাদের মৃত্যুর পর কেউ তাদেরকে মনে রাখে নি। তারা ভেসে গিয়েছে কালস্রোতে। অথচ যেসব কার্তিমান ব্যক্তিবর্গ মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরা অমর। নশ্বর পৃথিবীতে মানুষ অবিনশ্বর হয় কর্মগুণে। মানবকল্যাণে ব্যয়িত জীবন মানুষের মনে বেঁচে থাকে অনন্ত কাল। বস্তুত জীবনের সার্থকতা এখানেই নিহিত।

সারমর্ম

ফুটিয়াছে সরোবরে; কমল নিকর
ধরিয়াছে কি আশ্চর্য শোভা মনোহর।
গুণ গুণ গুণ রবে কত মধুকরে,
কেমন পুলকে তারা মধুপান করে
কিন্তু এরা হারাইবে এ দিন যখন;
আসিবে কি অলি আর করিতে গুঞ্জন
আশায় বঞ্চিত হলে আসিবে না আর,
আর না করিবে এই মধুর ঝংকার;
সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়,
অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়।
কেবল ঈশ্বর এই বিশ্বপতি যিনি,
সকল সময়ের বন্ধু সকলের তিনি।

[চট্টগ্রাম বোর্ড '১৯]

সারমর্মঃ

মানুষের ভালো সময়ে অনেকেই থাকে, কিন্তু দুঃসময়ে তাদের সবাইকে পাওয়া যায় না। এমন সুযোগসন্ধানী মানুষদের থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আর মনে রাখতে হবে, একমাত্র স্রষ্টাই আমাদের সবরকম সময়েরই পরম বন্ধু। কাজেই দুঃসময়ে মনোবল না হারিয়ে স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে।

DINAJPUR BOARD

অনুচ্ছেদ

একুশে বইমেলা

বা অমর একুশে গ্রন্থমেলা

[দি. বো. ১৯, ১৭; সি. বো. ১৭; য. বো. ১৯; মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা; সিলেট ক্যাডেট কলেজ; নোয়াখালী জিলা স্কুল]

অমর একুশে গ্রন্থমেলা বর্তমানে বাঙালির প্রাণের মেলা। এই মেলার ইতিহাস বাংলাদেশের মতই প্রাচীন। ১৯৭২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি চিত্তরঞ্জন সাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন বর্ধমান হাউজ প্রাঙ্গণের বটতলায় এক টুকরো চটের উপর কলকাতা থেকে আনা ৩২টি বই সাজিয়ে বইমেলার গোড়াপত্তন করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত তিনি একাই বইমেলা চালিয়ে যান। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমী এ মেলার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়। কালের পরিক্রমায় অমর একুশে গ্রন্থমেলা এখন অনেক বিস্তৃত ও পরিণত। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মেলাগুলোর অন্যতম এই মেলা। বইপ্রেমী বাঙালির চাহিদা মেটাতে বাংলা একাডেমি ২০১৪ সালে মেলার পরিসর বাড়িয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করেছে। ক্রেতাদের আকর্ষণে প্রকাশকদের আয়োজনের কমতি থাকে না। নান্দনিক স্টল ও দৃষ্টিনন্দন বই পাঠকের হৃদয়কে আন্দোলিত করে তুলে নতুন বই হাতে তুলে নিতে। মাসব্যাপী আয়োজিত এ মেলায় ক্রেতাদের জন্য থাকে বিশেষ ছাড়। বিখ্যাত লোকদেরও দেখা মেলে মেলায় এলে। মেলা চলাকালীন প্রতিদিনই বিভিন্ন আলোচনাসভা, কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে। মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে লেখককুঞ্জ, যেখানে লেখকরা উপস্থিত থাকেন ও পাঠকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এটি বাংলা একাডেমির একটি মহৎ উদ্যোগ ও আয়োজন। এই মেলা নিত্যনতুন পাঠক তৈরিতেও যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে চলেছে। সারা বছর নানা বয়সি মানুষ এ মেলার প্রতীক্ষায় থাকে। লেখক-প্রকাশক-পাঠকের অসাধারণ এক সেতুবন্ধ রচিত হয় এ মেলায়। এখানে এলেই সাহিত্যের সকল রসদের সন্ধান পান সকল শ্রেণীপেশার মানুষ। অমর একুশে গ্রন্থমেলা আমাদের জাতীয় চেতনার সাথেও সম্পৃক্ত।

SYLHET BOARD

ভাবসম্প্রসারণ

দুর্নীতি জাতির সকল উন্নতির অন্তরায়।

বা দুর্নীতি জাতীয় জীবনের অভিশাপস্বরূপ।

বা দুর্নীতি জাতীয় জীবনের সকল উন্নতির অন্তরায়।

[সি. বো, ১৯, ১৭; ঢা.বো, ১৫; কু. বো, ১৫:য, বো, ০৫:চ, বো. ১৩, ০৩]

নীতি ও নৈতিকতাবিরোধী কাজই হচ্ছে দুর্নীতি। এর প্রভাবে একটি জাতির স্বপ্ন ও সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের পথে যত প্রকার সমস্যা আসতে পারে দুর্নীতি তার মধ্যে অন্যতম। দুর্নীতি একটি জাতিকে নিঃশেষে ঠেলে দেয় অক্ষয়ের পথে। তাই একে দেখা হয় "অভিশাপ" রূপে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। শিক্ষা ও মূল্যবোধের যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট মনুষ্যত্ববোধ মানুষকে দান করেছে এ মহিমান্বিত মর্যাদা। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, মানুষের এ শ্রেষ্ঠত্ব আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। সততা ও সুনীতির প্রশ্নে মনুষ্য-সমাজের বিশিষ্টতা আজ তর্কাতীত নয়। কোনো জাতির সামগ্রিক জীবনাচরণে সততা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়ের অশনি সংকেত। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র আক্রান্ত হয় দুর্নীতির রাহুগ্রাসে। সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে জাতীয় অস্তিত্ব। সম্প্রতি আমাদের দেশে মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে দুর্নীতি নামক ব্যাধিটি। দুর্নীতি একটা জাতীয় সমস্যা। মুষ্টিমেয় মানুষ ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্যে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকে। কালক্রমে এটা অনিবার্য পথ ধরে গ্রাস করে শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে গোটা সমাজকে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলেই অবলম্বন করতে থাকে এ অসুদপায়টি। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি, ব্যাহত হয় জাতীয় উৎপাদন। এগুলো দুর্নীতির প্রত্যক্ষ ফলাফল। সচেতনভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, দুর্নীতির রাষ্ট্রীয়করণের সুদূরপ্রসারী ফলাফল খুবই ভয়াবহ।

দুর্নীতির ফলে জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে জাতি হয়ে পড়ে হতাশাগ্রস্ত— যা তাদের মধ্যে পাশবিকতার জন্ম দিয়ে থাকে। জাতীয় জীবনে দুর্নীতির রাহু যদি সমাজকে গ্রাস করে, তাহলে উন্নতির আশা করা বৃথা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতির ভয়াল থাবা বিস্তৃত হয়েছে। নিম্ন শ্রেণীর থেকে ধনাঢ্য ব্যক্তি পর্যন্ত সকল মহল এই চলেছে দুর্নীতির মহোৎসব।

অনেকে মনে করেন, দরিদ্রতার ফলেই আবির্ভূত হয় দুর্নীতি। অর্থাৎ সৎ পথ থেকে জীবনযাত্রার মান সঠিক পর্যায়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই অফিস-আদালতে নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী কর্মকর্তাগণ ঘুষ গ্রহণ করেন। কিন্তু দারিদ্র যে দুর্নীতির মূল কারণ নয় ,বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অবস্থা থেকে আমরা তা অনুধাবন করতে পারি। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এদেশের উঁচু মোহলের বহু রাঘব-বোয়ালকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করে শাস্তির ব্যবস্থ করেছেন। এ ব্যাপারে দুর্নীতি দমন কমিশন পালন করছে ঐতিহাসিক ভূমিকা। দেশের সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা , মন্ত্রী, রাজনীতিবিদদের দুর্নীতির নোংরা প্রবণতাকে। দুর্নীতির এ নেতিবাচক দিকটার সবচেয়ে বড় শিকার হয় যুবসম্প্রদায়। পরিশীলিত চিন্তাবোধের অভাবে সাফল্যলাভের জন্যে তারা সহজেই অশুভ ও ধ্বংসের পথ বেছে নেয়। এভাবে জাতীয় জীবনে সৃষ্টি হয় অস্তিত্বের সংকট ।

দুর্নীতিগ্রস্ত জাতি কখনও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করতে পারে না। আমাদের বিশেষত দেশের শিক্ষিত সমাজকে এটা উপলব্ধি করতে হবে। সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর সমাজ গড়তে হলে জাতীয় জীবন থেকে দুর্নীতি অপসারণ করা অতীব জরুরি।

সারমর্ম

তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ
নিদ্রিত আছেন সুখে জীবলীলা শেষে।
তাদের শোণিত অস্থি সকলি এখন
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে।
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমাদের ধূলিতে কালে মিলাবে আবার।

[সিলেট বোর্ড '১৯]

সারমর্মঃ

জন্মভূমির সাথে আমাদের নাড়ির সম্পর্ক। এখানেই আমাদের জন্ম, এই মাটিতেই বেড়ে ওঠা। এখানকার মাটিতেই আমাদের পূর্বপুরুষদের সমাহিত করা হয়েছে। আমরাও চাই, এই একই মাটিতে আমাদেরও শেষ সময় কাটুক। যেন পূর্বপুরুষদের সাথেই মৃত্যুর পরও আমাদের ঠাই হয়।

BARISAL BOARD

অনুচ্ছেদ

শিশুশ্রম

[রা. বো. ১৯, ১৭; ব. বো. ১৯; জালালাবাদ ক্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট; এস ও এস হারম্যান মেইনার স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

শিশুকাল অতিক্রমের আগে অর্থের বিনিময়ে বা বিনা বেতনে কেউ কায়িকশ্রমের কাজে নিয়োজিত হলে তাকে শিশুশ্রম বলে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এই ধরনের শ্রমকে শোষণ বলে বিবেচনা করে। বহু দেশে এটিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং আমাদের দেশেও শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করা হয়। শিশুশ্রমকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম দিবস পালিত হয়। মূলত অসচ্ছল ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা শিশুশ্রমের সাথে নিয়োজিত। অষ্টাদশ সতাব্দীর শেষ দিকে গ্রেট ব্রিটেনে সর্বপ্রথম শিশুশ্রম একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়। ২০০৬ সালে শিশু সনদে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবুও থেমে নেই শিশুশ্রম। লেখাপড়ার খরচ দিতে না পারা, সংসারের অসচ্ছলতা পিতা-মাতাকে বাধ্য করে সন্তানকে শ্রমে নিযুক্ত করতে। শিশুশ্রম শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ করে। একটি দেশের গুনগত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সকল বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয় তার মধ্যে শিশুশ্রম কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের মাঝে সুপ্ত থাকে অমিত সম্ভাবনা। আজকের শিশুই আগামী দিনের কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ বা শিক্ষাবিদ। ভবিষ্যতের কর্ণধার এই শিশুদের নির্ঝঞ্ঝাট ও মসৃণ পথচলা নিশ্চিত করতে পারলেই একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠনের পথ অনেকটা সুগম হয়। তাই রাষ্ট্র, সমাজ ও সুযোগ থাকলে ব্যক্তি উদ্যোগে শিশুশ্রম বন্ধে তৎপর হওয়া জরুরি। শিশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে ও তাদের বিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তবেই আজকের শিশু আগামী দিনের সম্পদে রূপান্তরিত হবে।

সারাংশ

প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষায় পাসটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবৃদ্ধ থাকে। এই কারণেই পরীক্ষায় পাস করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে, কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানীর। যেখানেই পরীক্ষা-পাসের মোহ তরুণ ছাত্রছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত জীবনযাপন করে। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে অক্ষয় আসন লাভ করতে হলে জ্ঞানের প্রতি তরুণসমাজকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। সহজ লাভ আপাতত সুখের হলেও জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হবে না।

[বরিশাল বোর্ড '১৯]

সারাংশঃ

শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাশের জন্য পড়াশোনার প্রবণতা সমাজে জ্ঞানের বিকাশের পথে বড় বাঁধা। এধরনের চর্চা্র ফলে সমাজে প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা আর হয় না। এতে করে সুলভে পাশ করা যায় ঠিকই, কিন্তু জ্ঞানী হওয়া যায় না।

সারমর্ম

বিরহ মিলন কত হাসি- অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।

[বরিশাল বোর্ড '১৯]

সারমর্মঃ

অমরত্বের সাধ মানুষের মনে চিরন্তন। কিন্তু বাস্তবে কারো পক্ষে অমর হওয়া সম্ভব নয়। এর বদলে আমরা যা করতে পারি, তা হচ্ছে নিজেদের কর্ম দিয়ে অন্য মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে। এর মধ্য দিয়েই মৃত্যুর পরও আমরা মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকতে পারব।